মৃত্যুর সাজঘরে অনিকেত সময় ও জীবনের আখ্যান

জ্যোতিপ্রসাদ রায়

> 'We can say that today's writing has freed itself from the dimension of expression, Referring only to itself, but without being restricted to the confines of its interiority, writing is identified with its own unfolded exeriority. This means that it is an inter - play of signs arranged less according to it's signified content than according to the very nature of the signifier.' ('What is an author?/Michel Foucault/ Modern criticism and Theory/ David Lodeg ed. / 4th Indian Reprint/ 2005.)

উত্তর - আধুনিক পর্যবেক্ষণে, কোনো আখ্যান থেকে যখন লেখকের স্ব-কাল ও স্ব-ভূমি অপেক্ষা যে কোনো কালের পাঠকের সময় ও পরিসরের যন্ত্রণা - আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-প্রত্যয় তথা আত্মবিরোধ উত্তরণের চিহ্ন ফুটে ওঠে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সেই প্রতিবেদনের বহুমাত্রিকতা আর 'সাধারণে'র বিবেচনাধীন থাকে না। এবং সেই আখ্যানের অন্তর্বয়নের তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের রুচি, মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোয় পরিস্ফুট করে নতুন নতুন জীবনমুখী দ্যোতনা ও চেতনা। তারাশঙ্কর এমন একজন লেখক, যিনি একযোগে স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা - উত্তর কালে লেখনী হাতে সক্রিয় ছিলেন। রাঢ় বাংলা তথা বীরভূমের মাটি - মানুষ সমাজ - অর্থনীতি - রাজনীতি ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণের মুখ্য উপাদান ও লেখক -সত্তা নির্মাণের মৌল প্রেরণা। বহু চর্চিত, তিনি গল্প - উপন্যাসের আখ্যানে যেমন গ্রামীণ সামন্ত্রতন্ত্রের ভাঙন ও বণিকতন্ত্রের উত্থানকে দেখিয়েছেন ('গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কালিন্দী', 'কালান্তর', 'কীর্তিহাটের কড়চা' ইত্যাদি); তেমনি বাউড়ি - ডোম - মুচি - বেদে - বাগদি - সাঁওতালের মতো নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির বিচিত্র পেশা - ধর্ম - আচার - সংস্কার - বিশ্বাস, পাল - পার্বন, নাচ - গান, মেলা - খেলা নির্ভর জীবনযাত্রার বহুবর্ণিল রূপ ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করেছেন (রাইকমল', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'স্বর্গ - মর্ত্য', 'ডাকহরকরা', 'রাধা', 'অরণ্য বহ্নি' ইত্যাদি)। তারাশঙ্কর তাঁর আখ্যানের সময় - চেতনার প্রেরণা সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানিয়েছেন—

'আমার কাল সে - কাল আর এ-কালের সন্ধিক্ষণের কাল।

আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে - কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘন পল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। ...মনে পড়ে কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে পড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অনন্তের ধ্যানে। এই আমার সে কালের ছবি। তাই সে কালকে শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি - বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মতো।... শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারি না সে-কালকে।'

'আমার কালের অপরার্ধ নূতন কাল যেন আমার মা।'

জ্যোতির্ময়ী - প্রসন্ন।

তিনি বলেন আঘাতে বিচলিত হয়ো না, ক্লান্ত হয়ো না, পথ চল। ...দুঃখ করো না। ...একালে অবজ্ঞা অবহেলা জীবনে যা এসেছে, তাই আমি পথে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলতে চেষ্টা করেছি আজীবন। আমার কালের যে অংশ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পালন করেছে আমাকে মায়ের মতো...এ হল তারই শিক্ষা। দীক্ষা আমার কালের সে-কালের কাছে।

অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল এহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ— আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত দৃষ্টি শুভ্রবাস পরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মুর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সে-কাল আর এ-কালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই।' (আমার কালের কথা/ তারাশঙ্কর/নিউ বেঙ্গল প্রেস/১৯৮৭)

কথাকার তারাশঙ্করের শিল্পদৃষ্টিতে এই কালচেতনার আবহে সচেতন কিংবা অচেতন প্রয়াসে কোনো কোনো আখ্যানে 'ভারতীয় মননে সনাতন মৃত্যুচেতনা'র স্বরূপ - অন্বেষণ মুখ্য প্রেরণা রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি উপন্যাসের প্রতিবেদনে যেমন দেশজ উচ্চবর্ণীয় সমাজের পটভূমিতে মৃত্যুচেতনার রূপ - বৈশিষ্ট্য ব্যাখা - বিশ্লেষণ করেছেন ; তেমনি নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো কোনো আখ্যানে ফুটে উঠেছে মরণশীল মানুষের জীবনাকুতি ও মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা - ভাবনা। এ প্রসঙ্গে আমরা 'আরোগ্য নিকেতন' ও 'কবি'র মতো বহুল পরিচিত ও পঠিত উপন্যাসগুলির তুলনামূলক পুনঃপাঠের আদর্শ গ্রহণ করতে পারি। পাশাপাশি এই দুই উপন্যাসে মৃত্যুচেতনা কীভাবে মুক্ত জীবনবোধের স্পর্শে কালোত্তীর্ণ মানবচেতনায় রূপান্তরিত হয়ে পাঠকের সময়তাড়িত জীবনসমস্যার উপর প্রশান্তির আবহ সৃষ্টি করেছে এবং তাকে 'মহিমময় মানুষ' হয়ে উঠতে প্রেরণা দান করেছে—তা-ও আমাদের কৌতূহলের বিষয়।

প্রচলিত দৃষ্টিতে 'আরোগ্য নিকেতন' -এর মূল সুর —আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও অ্যালোপাথি চিকিৎসা তথা মানুষের রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি - প্রয়োগের প্রেক্ষিতে সে - কাল আর এ-কালের জ্ঞান - চেতনার দ্বন্দ্ব। 'কবি'র মূল থিমে আছে ব্রাত্য, সভ্য সমাজের অবাঞ্ছিত ডাকাত বংশে জন্মগ্রহণ করা নিতাই ডোমের 'কবি' হয়ে ওঠার সংগ্রামমুখর কাহিনি। আমরা একবিংশ শতাব্দীর পাঠক, মরণ - বাঁচনের তাৎপর্য উপলব্ধি করি পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ এবং আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে। এখন আর জীবনমশাইরা মুমূর্ষু রোগীর সামনে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর সন্তান 'ব্যাধি'- আক্রান্তের নাড়ি ধরে 'নিদান হাঁকা'র পর রোগী কিংবা তার পরিবারের সঙ্গে 'ভালবাসার সম্পর্কের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। মৃত্যুপথযাত্রী রোগী সম্পর্কিত চিকিৎসকের চেতনা আজ সেবা - কল্যাণমুখী নয়; পরিষেবার নামে আর্থিক লেনদেন আর বাজার ব্যবসার নিরিখে জীবন নিয়ে যেন ভানুমতীর খোল! সামাজিকভাবে অপাঙক্তেয়, দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত বসনকে নিগূঢ় ভালবাসার টানে আজ কোনো নিতাই একাকী বুকে নিয়ে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ জানায় না বিদায়বেলায়!

অর্থাৎ জীবন - অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের মৃত্যুচেতনার অন্তরাল থেকে পাঠকের চোখে ফুটে উঠেছে নিজের সময়ের অবক্ষয়িত রূপ ও মানবিক মূল্যাবোধের অধঃপতন! এই প্রবণতাগুলির স্বরূপ কমবেশি প্রতিফলিত হয়েছে 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতন'-এর প্রতিবেদনে...জগদ্বন্ধু, জীবনমশাই, নিতাই, প্রদ্যোত ডাক্তার, বসন, মতির মার আচার - আচরণে, সংলাপে তথা ব্যবহারিকতায়।

দৃষ্টান্ত ঃ

(১) দেবীপুর গ্রামের প্রবীন কবিরাজ ও 'আরোগ্য নিকেতন' -এর প্রতিষ্ঠাতা জগদ্বন্ধু, তার পরবর্তী প্রজন্ম জীবন দত্তকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পাঠদানের সময় মহাভারত অবলম্বনে মৃত্যু দেবীর আবির্ভাব ও তার রূপ বর্ণনা করেছেন... 'ভগবান প্রজাপতি মনের আনন্দে সৃষ্টি করে চলেছেন, সৃষ্টির পর সৃষ্টি। বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর। তখন পৃথিবীতে শুধু সৃষ্টি-ই আছে লয় বা মৃত্যু নাই।' ফলে 'একটি বৃহৎ অংশ জীর্ণ, মলিন, স্থবির, কর্কশ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর এই জরা-দশা মোচনের জন্য প্রজাপতি সৃষ্টি করল এক নারী—'পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণ; গলদেশ ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, সঙ্গে গৈরিক কাষায়...।' এ জগতে মৃত্যুদেবীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রজাপতির স্পষ্ট ঘোষণা, 'সৃষ্টিতে সংহার কর্মের জন্য তোমার সৃষ্টি হয়েছে। সেই তোমার কর্ম।'

(২) 'জগবন্ধু মশায় বলেছিলেন— মৃত্যু অন্ধ, মৃত্যু বধির। রোগই তার সন্তানের মতো নিয়ত তার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ম— কাল। যার কাল পূর্ণ হয়, তাকে যেতে হয়। অকাল মৃত্যুও আছে। নিজের পাপে মানুষ নিজের আয়ুক্ষয় করে কালকে অকালে আহ্বান করে।'

(৩) নিম্নবর্গীয় ডোম সমাজের প্রতিনিধি নিতাই -এর মৃত্যু সম্পর্কিত অনুভূতির উৎস হল ঘাত - প্রতিঘাতময় জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা ও লোকপুরাণ চর্চা। কবিয়ালের ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণে সেই অনুভূতির ভাব - রূপ লিপিবদ্ধ করেছেন তারাশঙ্কর— 'মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতোই একটা ভয়— একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার (নিতাই) ছিল। এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল। মনে হইতেছে বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত। কপালে হাত রাখিয়া কতদিন সে চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন ছাঁক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিত যে না চমকিয়া পারিত না। আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কড়াকাড়ি করিয়া গেল!

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'কবি'র আখ্যানে অশিক্ষিত প্রান্তীয় - সংস্কৃতির প্রতিনিধি নিতাইয়ের কাঁচা মাটির অভিজ্ঞতা ও গভীর অনুভূতির নিরিখে মৃত্যুচেতনার যে সন্দর্ভ বসন - কেন্দ্রিক ভালবাসার প্রেরণায় শিল্পরূপ লাভ করেছে— তার বাহ্যিক লক্ষণগুলি হল, (ক) কঠিন রোগাক্রান্ত বসনের শারীরিক প্রদাহ ও তার চেতনা জুড়ে ক্রমশ মৃত্যুর আগমন 'মনে হয় আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কতা কি মিথ্যে হয়?; (খ) রোগীর চারপাশের জীবিত অস্তিত্বে (যেমন—ললিতা, নির্মলা, বেহালাবাদক, দোহার ইত্যাদি) বসনের মৃত্যুজনিত ভয়ের আতঙ্ক এবং 'মরণের ছোঁয়াচ'। পরবর্তী স্তরে 'মরণ' কী কিংবা মানবজগতে 'মরণ' কীভাবে আসছে সে প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর নিতাই ডোমের অশিক্ষিত চোখে পুরাণ পাঠের অভিজ্ঞতাকেই প্রতিবেদনে ব্যবহার করেছেন— 'মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ও মানুখের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়! ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্মবিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়।'

গ্রামীণ শিক্ষা - সংস্কার - সংস্কৃতির প্রতিনিধি নিতাই -এর মনে এইভাবে দেশজ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যুচেতনার আবহ। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে উত্তর - আধুনিক কালের পাঠক কী— অকালে প্রিয় বিচ্ছেদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভিতরে ভিতরে সন্ধান করে না এমন অমোঘ কথা ও সুরের স্বপ্নময় মায়াপুরীতে বিচরণ করতে করতে একখণ্ড প্রশান্তির স্বর্গ ঃ

'এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল সেতায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত— হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়! জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

সুতরাং নিতাই, বসনের অকাল মৃত্যুতে জীবন-মরণের দ্বান্দ্বিকতায় যত আন্দোলিত হয়েছে; তত-ই তার ভাববাদী কবিসত্তা খুঁজে পেয়েছে মহাজীবনের রূপ - রং - স্পর্শ এবং গানের মাধুরীতে প্রতিভাত হয়েছে দেশকাল নিরপেক্ষ নশ্বর মানবজীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সকরুণ আকুতি ঃ

'বসন বলিয়াছিল, কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুনি কেনে বাঁধলে কবিয়াল। গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ— যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায়— মরণে কি তাই মেলে? সুর গুনগুণ করিয়া উঠিল।

জীবনে যা ছিল না কো মিটবে কি হায় তা মরণে?'

'কবি'র ন'বৎসর পর 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানে তারাশঙ্কর কখনো মিথ - পুরাণ, আবার কখনো লৌকিক বিশ্বাস - সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে অন্বেষণ করেছেন মৃত্যুর স্বরূপ এবং গ্রামীণ সামাজিক জীবন - সম্পর্ক - সংস্কৃতিতে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। এই আখ্যানের বিস্তার কমবেশি (১৮৭০ - ১৯৫০) সাল। উনবিংশ শতাব্দীর দরিদ্র, ধর্ম - বর্ণ - জাতপাত যুক্ত অসংহত গ্রামীণ সমাজ রোগ - জ্বালা - যন্ত্রণা কবিরাজ

প্রতিষ্ঠিত 'মশায়ের কোবরেজখানা'য়। কবিরাজ মশায়ের মিথ-পুরাণ নির্ভর জ্ঞান-বিশ্বাসে, মৃত্যু হল নারী, অন্ধ ও বধির। নারী হৃদয়ের চিরন্তন মমতা ও ভালবাসার কারণে সে সরাসরি মানব জীবন ছিনিয়ে নিতে পারে না। তাই প্রজাপতি তার সন্তান রূপে সৃষ্টি করল 'ব্যাধি'। রোগের ছদ্মবেশে মানব-সংসারে তার আবির্ভাব। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে চরিত্রের বয়ানে, নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছে জগৎ ও জীবনের এক অমোঘ সত্য—মৃত্যুর অভিঘাতে জগৎ থেকে যেমন জরা-স্থবির-জীর্ণতার প্রস্থান ঘটে, তেমনি সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য সাথে সাথে আগমন ঘটে 'জীবনের নবীনতা'। কবি উপন্যাসে নায়ক নিতাই এর অন্তরে মৃত্যুচেতনার অন্তরালে জীবনের মহার্ঘতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তার প্রেয়সী বসনের অকাল মৃত্যুতে। আর 'আরোগ্য নিকেতন' -এ জগদ্বন্ধু কবিরাজ কিংবা তার পুত্র জীবনমশায়ের কাছে মৃত্যু যেন জীববিজ্ঞানী - কৃত জীবনচক্রের বার্তা, জগত ও জীবনের রূপান্তরের জলসাঘর ? 'কর্মফল তোমাকে আহ্বান করবে এই রোগেদের মাধ্যমে। অনাচার, অমিতাচার, ব্যাভিচারের ফলে রোগাক্রান্ত হবে মানুষ। তুমি তাদের দেবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি; জ্বালা থেকে শান্তি, পুরাতন জন্ম থেকে নব জন্মান্তর।'

অর্থাৎ 'কর্মফল' -এর মাধ্যমে দেশজ বিশ্বাস - সংস্কার নির্ভর রূপ আর 'পুরাতন জন্ম থেকে নব জন্মান্তর'-এর বয়ানে সেই দেশজ জনমানসের চরিত্র পরিবর্তনের ইঙ্গিত উদ্ধার করেছেন তারাশঙ্কর, তাঁর সার্বিক কালচেতনা তথা ইহজীবনের কঠিনতম সত্য— মৃত্যুচেতনার প্রেক্ষাপটে। তাই নিতাই কবিয়ালের কাছে যে জীবনসত্য ছিল আত্মভাবের প্রকাশ (expression of self-impression)-'হায়! জীবন এত ছোট কেনে?' 'আরোগ্য নিকেতন'-এ সেই জীবনবোধ রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ করেছে সমষ্টিগত মাত্রা। তাই অসুস্থ মতির মায়ের মতো একজন সাধারণ অশিক্ষিত গ্রামীণ বৃদ্ধা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ভিটেমাটি - ঘরসংসার-ছেলে পুলেসহ ইহজীবনের যাবতীয় সম্পর্ক ও অস্তিত্ব হারানোর গভীর চিন্তায় (expression of social existance) প্রাণপণে ঘোমটা সরিয়ে জীবন ডাক্তারকে নিঃসংশয়ে জিগ্যেস করেছে— 'ওষুধ দেবেন না? যা খুশি তাই খাব? আমি তাহলে আর বাঁচব না? ...বিচিত্র সে দৃষ্টি! কঠিনতম প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে সমুদ্যত হয়ে রয়েছে। জীবনের শেষ প্রশ্ন।' এর উত্তর সন্ধান করেছেন জীবন ডাক্তার সে-কাল আর এ-কালের সম্মিলিত মৃত্যুর ভাবনার দৃষ্টিতে। আধুনিক অ্যালোপাথি চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, দরিদ্র অসহায় গ্রামীণ নরনারীর অকাল মৃত্যু যখন স্বেচ্ছায় রোধ করতে পারেনি ডাক্তার; তখন আত্মপরাজয়ের গ্লানি প্রশমনের জন্য সমর্থন খুঁজেছেন শাস্ত্রে, আবার কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিষ্ঠুর মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন পরিবেশ - পরিস্থিতির প্রক্ষেপে—

''বেচারী মতির মা পিছনে পড়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে। তাকে দোষ দিতে পারবেন না। ছেলে, বউ, নাতি, নাতনী, ঘর-সংসার—বড় জড়িয়ে পড়েছে বুড়ী।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।।

বুড়ী সেই সনাতন 'আশ্চর্য' হয়ে উঠেছে আজ। কিন্তু যেতে হবে বুড়ীকে। আর যাওয়াটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। হ্যাঁ, মঙ্গল। নইলে দুর্ভোগের আর অন্ত থাকে না।''

'আরোগ্য নিকেতন' -এর জীবনমশায় পিতার কাছে দেশজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং রঙ্গলাল ডাক্তারের থেকে শিখেছিলেন অ্যালোপাথি চিকিৎসা। সেই অভিজ্ঞতার জোরে তিনি রোগ ও রোগীর নাড়ী ধরে বলতে পারেন মৃত্যুর দিনক্ষণ। এরপর রোগী ও তার পরিবার - পরিজনদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিচ্ছেদজনিত এক অদৃশ্য হিম আতঙ্কবোধ এবং সবশেষে ঘটে রোগীর দৈহিক মৃত্যু। এই স্তরগুলি মতির মা, রানা পাঠক, কখনো বনবিহারী, আবার কখনো জীবন দত্তের নাটকীয় ঘাত - প্রতিঘাতময় মৃত্যু কিংবা মৃত্যুচেতনার বিষাদ - করুণ আবহে সুগভীর জীবনজিজ্ঞাসার কৌতূহলে ব্যাখ্যা করেছেন 'মহিমময় মানুষে'র জীবন - সন্ধানী শিল্পী তারাশঙ্কর। অন্যদিকে, আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মানবমনে মৃত্যুচেতনার সে -কাল ও এ-কালের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ফুটে উঠেছে জীবন দত্ত ও রঙ্গলাল ডাক্তারের কথোপকথনে। যথা—

(ক) দেশজ জনপদের মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে, কবিরাজ-ডাক্তার জীবন দত্তের অভিব্যক্তি— 'মৃত্যু যেন দু'হাত বাড়িয়ে, উন্মাদিনীর মতো ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাড়া করে ছুটেছে, মানুষ পালাচ্ছে, আগুনলাগা বনের পশুর মতো দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে।'

(খ) এই প্রসঙ্গে তাঁর গুরু রঙ্গলাল চিহ্নিত করেছেন, এ-কালের চিকিৎসা বিদ্যার অগ্রগতি এবং রোগীর মৃত্যুভয় জয় করার প্রবণতা— 'শুধু পালানোটাই চোখে পড়ছে তোমার; মানুষ তার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করছে দেখছ না? পিছু হটেই আসছে সে চিরকাল— কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে আসেনি। নূতন নূতন অস্ত্র উদ্ভাবন করছে, আবিষ্কার করছে। সে চেষ্টার তো কোনো বিরাম নেই। একথা জীবন দত্ত সেদিন অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর চোখের সামনেই কত নতুন নতুন ওষুধ আর চিকিৎসার প্রয়োগ হতে দেখলেন— রক্তচাপ পরীক্ষা, মূলমূত্র - রক্ত - চামড়া পরীক্ষা, প্রল্টুসিল, সালফাগ্রুপ, পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, এক্সরে পরীক্ষা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, স্ট্রেপটোমাইসিন পি.এ.এস., কতো নতুন ইনজেকশন— কতো নতুন অস্ত্র চিকিৎসা। জীবনমশায়ের জ্ঞান - অভিজ্ঞতার বাইরে আরোগ্য লাভের, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামের কতো নতুন পদ্ধতি।'

সুতরাং মৃত্যুচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সে-কাল আর এ-কালের গ্রামীণ জনমানসের তুলনামূলক বিচারে, যেমন দেশজ সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তেমনি তরুণ প্রদ্যোত ডাক্তারের জীবনদর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে বিনির্মাণের বয়ান। কবিরাজ জীবন দত্তের মতো রোগ - যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির জন্য সে মৃত্যুর সন্ধান কনেনি; বরং সংগ্রাম - মুখর ইতিবাচক জীবনচেতনার মধ্যেই সে অন্বেষণ করেছে বেঁচে থাকার রসদঃ 'নতুন কাল। বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট, নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ— অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে।' এভাবেই পাঠকের অভিজ্ঞতা ও চেতনা কালান্তরের অভিঘাতে 'কবি' ও আরোগ্য নিকেতনে'র আখ্যানে খুঁজে পায় 'signified content' অপেক্ষা 'the very nature of the signifier'। রসিকের অন্তরে তখন জেগে ওঠে কথাকার তারাশঙ্করের শিল্পীমানসের কালোত্তীর্ণ

নান্দনিকতার সংকেত- বিশ্ব; যা 'freed itself from the dimenision of expression'—যা পরাপাঠে হয়ে ওঠে মৃত্যুর সাজঘরে অনিকেত সময় ও জীবনের নতুন আখ্যান এবং বেঁচে থাকার অনন্য প্রেরণা।

'কবি'-র নিতাই অসহায়ের মতো ভাবালু দৃষ্টিতে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে এবং স্বভাবোচিত কাব্য ভাষ্যে নিজের গভীরতর বেদনাকে প্রকাশের পর হয়ে উঠেছে 'মধুরতমে'র গীতিকার— 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.' অন্যদিকে কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটা, সেকাল আর একালের জীবন - মৃত্যুর প্রত্যক্ষ রূপদর্শনে অভিজ্ঞ জীবনমশায় স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত করেছেন মৃত্যু ও মৃত্যুভয় উত্তরণের দেশজ পদ্ধতি ও প্রকরণ ঃ

১। 'মৃত্যুকে জয় করা যাবে না কিন্তু মানুষ অকাল মৃত্যুকে জয় করবে।' তাই কেউ সাবিত্রী - বেহুলার মতো বার -ব্রত-পূজা-অর্চনা তথা দেশজ বিশ্বাস - সংস্কারের অভ্যাসে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চায়। যেমন বিধবা অভয়া সেই বিশ্বাসে, উপবাস আর ব্রাহ্মণ ছাড়াও জীবনমশায়ের মতো প্রবীণকে ভোজন করিয়ে আশা করে সে, 'আগামী জন্মে পাবে অবৈধব্য ফল। ...আবহমান কাল গভীর বিশ্বাসে এই ব্রত করে এসেছে এ দেশের মেয়েরা।'

২। জীবনমশায়ের মুক্ত দৃষ্টি ও নিরাসক্ত অনুভবে ফুটে উঠেছে নশ্বর জীবনের চিরন্তন সত্য স্বরূপ ঃ 'মনে মনে বলেছিলেন— চিকিৎসক হিসাবে আমি জানি, মৃত্যু পাপের বিচার করে না, পুণ্যের বিচার করে না; সে আসে ক্ষয়ের পথে, ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব!'

৩। এ কথা জেনেও প্রবলভাবে জীবনসম্ভোগী মানুষ কালে কিংবা অকালে জীবনের অন্তিম - কিনারে পৌঁছে আশীর্বাদ কিংবা প্রার্থনা করে 'আলো মাটি- আকাশ' অথবা চিরপ্রশান্তি ঃ 'তবু আজ আমি বারবার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামী জীবনে ক্ষয় প্রবল হলেও যেন তেমার পুণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।' (সাবিত্রী ব্রতকারী বিধবা অভয়ার প্রতি জীবনমশায়।)

৪। 'বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিল তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি হাসিয়া সে এক দৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।'

৫। 'প্রদ্যোত ডাক্তার বললে—কাল থেকে প্রায় ধ্যানে বসেছেন। চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসে রয়েছেন। ...মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছিলেন। সে আসছে তিনি জানেন। তার পায়ের ধ্বনি তিনি যে শুনতে পেয়েছেন।...শেষ মুহূর্তে সজ্ঞানে তার মুখোমুখি হতে চান। তার রূপ থাকলে তিনি দেখবেন; তার স্বর থাকলে সে কণ্ঠস্বর শুনবেন; তার গন্ধ থাকলে সে গন্ধ শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করবেন; তার স্পর্শ থাকলে সে স্পর্শ তিনি অনুভব করবেন। মধ্যে মধ্যে ঘন কুয়াশায় যে সব ঢেকে যাচ্ছে। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত, বর্তমান, স্মৃতি, আত্মপরিচয়, স্থান, কাল সব। আবার ফিরে আসছেন। চোখ চাইছেন। সে এল কি? এরা কারা? বহু দূরের অস্পষ্ট ছায়াছবির মতো এরা কারা?

অতি ক্ষীণভাবে ওদের স্বর যেন কানে আসছে। কী বলছে? কী?

—কী হচ্ছে?

মশায় ঘাড় নাড়বেন, জানি না। ঘাড় নাড়তে নাড়তেই ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি আবার নেমে এল। প্রদ্যোত দেখলে— প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া শীর্ণ মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।'

রাঢ় সংস্কৃতির উদ্ভাসিত সমন্বয়ধর্মী ও মিলনমুখী চেতনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন বলেই তারাশঙ্কর সগর্বে বলতে পেরেছেন— 'আমি একজন কথাকার মাত্র। আমাদের চারিপাশে যে প্রভূত জ্ঞানের সম্ভার থরে থরে নানা গ্রন্থরাজির মধ্যে গ্রন্থিত ও সজ্জিত তা থেকে আমি জীবনে সামান্যই সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার যেটুকু জ্ঞান বা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশই আমি অর্জন করেছি আমার সম্মুখে প্রবাহিত প্রত্যক্ষ জীবনের শোভাযাত্রা থেকে। সে শোভাযাত্রায় রাজা ছিল না, ধনী ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষ এদেশের এখানকার এই (রাঢ় অঞ্চলের মানুষ।'? (রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী/ তারাশঙ্কর/ সাহিত্য সংসদ/ ১৯৭১) সেই অকৃত্রিম সহজ সরল মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনাচারের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে স্ত্রী মঞ্জুর সঙ্গে তরুণ অ্যালোপাথি ডাক্তার প্রদ্যোতের ঘরোয়া কথোপকথনে ঃ

মঞ্জু ঘর থেকে বেরিয়ে এল... এ কী খেলে না চা?...

—না, ভাল লাগছে না। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে প্রদ্যোত বললে—শেষটায় ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলাম! তোমার অসুখের সময় সাহায্য সব ডাক্তারেই করেছিলেন, কিন্তু মশায়ের সাহায্যের চেয়ে ভালবাসা বড়।' এখানেই রাঢ় সংস্কৃতির জিৎ অথবা প্রাতিস্বিকতা; নাগরিক সংস্কৃতির হার। গ্রামীণ ঐতিহ্যতাড়িত লোকধর্মের জয়; শহুরে পেশাদারি সম্পর্কের পরাজয়!

তাই একবিংশ শতাব্দীর পাঠক, মৃত্যুচেতনার প্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের উপন্যাস পুনঃপাঠের পর ক্রমশ উপলব্ধির স্তরভেদে বুঝতে পারছেন আত্ম - অস্তিত্ব ও সামাজিক পরিসরের নিদারুণ বিপর্যস্ত রূপ! ভারসাম্যহীন টানাপোড়েন, নিজস্ব বৃত্তে -ও এক বাচাল অস্থিরতা। কারণ 'রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে স্থান-কালের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সূর্য স্থির আছে, গতিশীল রূপান্তরিত হচ্ছে— কালো জলের বুকে পদ্মের পাপড়ি খুলে যাওয়া এবং মুদিত হওয়ার মধ্যে মানুষের জীবনলীলাও তো তেমনি সাময়িক রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে আপেক্ষিক।' [সাহিত্যের সত্য/ তারাশঙ্কর/ আনন্দ পাবলিশার্স (পরিবেশক) /১৯৬০] এখন পাঠকের না আছে নিতাই কিংবা জীবনমশায়ের মতো জীবনমুখী ধ্যানদৃষ্টি, না আছে তারাশঙ্করের মতো নিজস্ব পরম্পরার চির অগ্নি বুকের গভীরে জ্বালিয়ে রেখে একাকী নীলকণ্ঠ হওয়ার বাসনা?

*** 'কবি' ও 'আরোগ্য নিকেতনে'র পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে, 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে প্রকাশিত তারাশঙ্করের ৭ম ও ১০ম খণ্ড রচনাবলী থেকে।